# নিউক্লিয়ার পাওয়ার: শক্তি সমস্যার সম্ভাব্য গ্রহনযোগ্য সমাধান

Published on The Daily JaiJaiDin, 24th and 25th July, 2007

গত ২৪ জুন ছিল বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ন একটি শুভ দিন। এই দিনই আমাদের জ্বালানী উপদেস্টা তপন চৌধুরী ঘোষনা করেন যে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল আটটি দেশ পারমানবিক শক্তি ব্যাবহার করে বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য আর্ন্তজাতিক আনবিক শক্তি কমিশনের অনুমোদন লাভ করেছে। সংবাদটির গুরুত্ব সবাই অনুধাবন করতে না পারলেও আমার বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার ফাওজুল ইসলাম(শাকের) পেরেছিল এবং টিভি সংবাদে বিষয়টি জানার পরপরই আমাকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছিল - যেমনটা আমরা করে থাকি ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের যে কোন সাফল্যের পর। আমি তার কাছ থেকেই প্রথম সংবাদ পাই এবং পরদিনের পত্রিকা থেকে বিস্তারিত জানতে পারি (যদিও অধিকাংশ পত্রিকা সংবাদটি যথাযথ গুরুত্বের স্বাথে প্রকাশ করেনি।)

এই সংবাদে আমার আনন্দিত হবার বা আমাকে অভিনন্দন জানাবার কারণ হচ্ছে গত বছরের জুনে এ'ব্যাপারে আমার একটি লেখা যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটাই ছিল আমার কোন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখা। সেটা লেখা হয়েছিল তারও ৩-৪ মাস আগে যখন যায়যায়দিন ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এই পত্রিকায় আমার একটা লেখা প্রকাশিত হবে। তাই অনেক পরিশ্রম করে, প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে লেখাটি তৈরি করেছিলাম। তবে সাপ্তাহিক যায়যায়দিনের কলেবরের কথা মাথায় রেখে লেখাটি যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস থাকায় সেখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তার পরও লেখাটি মনেহয় বেশ ভাল হয়েছিল, কারণ বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব সাইটের বিদ্যুত র্বতা অংশে এটি স্থান পেয়েছে।

এই নতুন প্রেক্ষাপটে মানুশের মধ্যে নিউক্লিয়ার পাওয়ারের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ তৈরী হয়েছে। আমার অফিসের কয়েকজন সহকর্মীও(যারা মুলত ব্যংকার) দেখলাম এ'ব্যাপরে খুবই আগ্রহি। তা'ছাড়া আমাদের যায়যায়দিনও এখন দৈনিক প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে আশা করা যায় তারা পাঠকদের আগ্রহ বিবেচনা করে এ'ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান ব্যাবস্থা করবেন। তাই আবার নতুন ভাবে তথ্য-উপাত্য সংগ্রহ করে অত্যাসন্য শক্তি সমস্যা এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেস্টা করছি। এ'খানে বলে রাখা ভাল - আমার নিউক্লিয়ার বিষয়ে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা নেই - বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা থাকার কথাও নয়। আমার ভরসা কেবল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হিসেবে এবং পাশ করার পর নিজের আগ্রহে যৎসামান্য পড়াশুনা। আর আমার তথ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে ইন্টার্নেট। ইন্টার্নেট এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেবাসের বই ঘেটে যা পেয়েছি তাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেস্টা করব।

**আসন্য শক্তি সমস্যা:** আমরা সবাই জানি নিউটনের প্রথম সুত্র অনুসারে শক্তি ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়। আর র্বতমানে প্রীথিবিতে যত প্রকার শক্তির ব্যাবহার হয় তার মধ্যে বিদ্যুতই প্রধান। মানুশের জীবন যাপনের মান যত উন্নত হবে এই বদ্যুতের ব্যাবহারও ততই বাড়তে থাবে। চিন্তা করুন বাংলাদেশের বিদ্যুতহীন গ্রামে বসবাসকারী একটা পরিবার মাসে কতটুকু শক্তি ব্যাবহার করে। জ্বালানির জন্য কিছু জ্বালানী কাঠ আর সন্ধার পর কয়েক ঘন্টা আলোর জন্য সামান্য কেরোসিনই সেখানে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। র্বতমানে কৃষি কাজে ব্যাবহার করা ডিজেলকে হিসেবে ধরলেও মাথাপিছু শক্তি ব্যাবহারের হার খুব একটা বৃদ্ধি পাবে না। আর যেসব গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয়েছে সেখানেও তার ব্যাবহার খুবই সীমিত। সেই তুলনায় ঢাকা বা চট্টগ্রামের মত শহরে বসবাসকারী পরিবারগুলোর শক্তি ব্যাবহারের অবস্থা কেমন? আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে আলো, বাতাস, বিনোদন এবং কাজের জন্য যে বিদ্যুত শক্তি ব্যাবহার করি তা'ছাড়াও পরোক্ষভাবেও আমাদের জন্য প্রচুর শক্তি ব্যায় করতে হয়। যেমন আমরা যে বিল্ডিং-এ থাকি, যে রাস্তার উপরদিয়ে যে যানবাহনে চলাচল করি, তার র্নিমান কাজে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় রড, সিমেন্টসহ প্রতিটি উপকরণ তৈরীতে প্রচুর শক্তি ব্যায় করতে হয়। বস্তুত আমরা শিল্প কারখানায় তৈরী করা যে জিনিসই ব্যাবহার করি না কেন তার পিছনেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে আছে শক্তির ব্যাবহার। এক হিসেবে দেখাযায় ঢাকায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুশ গড়ে প্রতিমাসে শুধুমাত্র বিদ্যুত শক্তিই খরচ করে ৫০ ইউনিটেরও(এক কিলোওয়াট বিদ্যুত এক ঘন্টা ধরে ব্যাবহার তাকে এক কিলোওয়াট আওয়ার বা এক ইউনিট ধরা হয়) বেশি। এই শক্তি ব্যাবহারের হার স্বভাবতই নিম্নআয়ের তুলনায় উচ্চ আয়ের মানুশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমানে বেশী। আবার লন্ডনে বসবাসকারী প্রতিটি মানুশ প্রতি মাসে বিদ্যুত ব্যাবহার করে 500 ইউনিটেরও বেশী। এজন্য ইদানিং কোন দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান বুঝানোর জন্য মাথাপিছু বিদ্যুত ব্যাবহারকেই সুচক হিসেবে ব্যাবহার করা হচ্ছে। অর্থাত যে দেশের মানুশ যত বেশি বিদ্যুত ব্যাবহার করে সেই দেশের মানুশ তত বেশি উন্নত। এখন চিন্তা করুন বাংলাদেশের সকল মানুশের জীবন যাত্রার মান লন্ডনের মানে নিতে হলে কি পরিমান বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশের কথা নাহয় বাদই দিলাম, কারণ বাংলাদেশের সকল মানুশের জীবন যাত্রাম মান লন্ডন তো নয়ই ঢাকার মত হতেও বহু দিন লাগবে, কিন্তু চিন এবং ভারত তো সেই পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে এবং খুব দ্রুততার সাথেই অগ্রসর হচ্ছে। গত শতাব্দিতে উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছে ইউরোপ এবং আমেরিকা। তাদের সেই উন্নতির সময় কমবেশি ৫০ কোটি মানুশের জীবন যাত্রার মান ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে। সেই উন্নয়নের ধাক্কা সামলাতে গিয়েই পৃথিবীর কয়লা-তেল-গ্যাসের মজুদ প্রায় শেষ করে ফেলা হয়েছে, আর আগামী শতাব্দিতে যে ভারত আর চিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে তাদের জনসংখ্যা দুই শত কোটির উপরে। তাহলে চিন্তা করুন সেই উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে কি পরিমান শক্তি সরবরাহ করতে হবে? এই বিপুল শক্তি চাহিদা পুরোন করতে গিয়ে পৃথিবীর তেল-গ্যাস তো শেষ হয়ে যাবেই উপরন্তু যে কয়লার ব্যাবহার পরিবেশ দুষনের অপরাধে বেশ কিছুদিনে ধরে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে তারও পুন:ব্যাবহার শুরু হবে এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করার পর তাও একদিন ফুরিয়ে যাবে কিন্তু এই বিশাল জনগোস্ঠির দুই দেশের শক্তি চাহিদা তাতেও মিটবে না।

এই প্রক্ষাপটে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে সামনে ভয়াবহ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পরে না। আমেরিকা যে ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ইরাক দখল করে আগামী দিনের জন্য তেল সঞ্চয় করছে তাও সেই ভয়াবহ ভবিষতেরই ইঙ্গিত বহন করে। সেই অবস্থায় তেলে দাম যা হবে তাতে বাংলাদেশের গ্রামীন জনগোস্ঠির জন্য সামান্য কেরোসিনের ব্যাবস্থা করা এবং নিজেদের মাটির নিচে সংরক্ষিত তেল-গ্যাস নিজেদের দখলে রাখার মত সামরিক ও কুটনৈতিক সক্ষমতাও আমাদের থাকবে কি না সেটাও একটা গুরুত্ব পুর্ন প্রশ্ন। এই লেখায় সামরিক বা কুটনৈতিক বিষয় অবতারনা করার সুযোগ নেই, আমরা সে দিকে যাবও না। আমরা চেস্টা করব আমাদের আলোচনা প্রযুক্তিগত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার।

বাংলাদেশ এবং বিশ্বের জ্বালানী বা শক্তি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাকে একজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। তিনি হচ্ছেন আমাদের চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম. শামসুল আলম স্যার(এস. আলম স্যার হিসেবে অধিক পরিচিত)। আমরা যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তখন তিনি ছিলেন আমাদের ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ডিপার্টমেন্টের হেড। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাকে প্রজেক্ট টিচার হিসেবে পাওয়ার এবং সেই সুত্রে তাঁর ঘনিস্ট সান্নিধ্যে আসার। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালে এনার্জি ইনিস্টিটিউট নামে একটি প্রতিস্ঠান তৈরী করেছেন শক্তি বিষয়ে কাজ করার জন্য। আমরা চতুর্থ বর্ষে থাকা কালিন তিনি এই ইনিস্টিটিউটের পক্ষ থেকে একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমাদেরকে বলেছিলেন সেই সেমিনারে উপস্থাপন করার জন্য কিছু লেখা তৈরী করতে। লেখার বিষয় হবে আগামী দিনের পৃথিবীর জ্বালানী, বিশেষ করে বিদ্যুত সমস্যার সমাধানের উপায়। তিনি আমাদের বর্তমানে প্রাপ্ত প্রযুক্তির বাইরে গিয়ে কল্পনার পাগলা ঘোরা ছুটিয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন দেখি তোমরা কে কতদুর কল্পনা করতে পার। কারণ যে কোন কিছু আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তা কল্পনা করা। যদিও নানা জটিলতার কারনে সেই সেমিনারের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি – যা বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার – কিন্তু আমি সেই সেমিনারের জন্য একটা লেখা তৈরী করেছিলাম এবং তা করতে গিয়েই প্রথম বারের মত এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের বিষয়ে অবহিত হই।

আমি সেই লেখায় কল্পনা করেছিলাম এমন একটি প্রকৃয়া আবিষ্কৃত হবে যার মাধ্যমে কম তাপমাত্রার তাপ শক্তিকে একটি গ্রহনযোগ্য অনুপাতে বিদ্যুতে রুপান্তর করা যাবে। যদি তা করা যায় তাহলে আশা করা যায় বিশ্বের শক্তি সমস্যার মোটামুটি স্থায়ী সমাধান পাওয়া যাবে। কারণ সুর্যের রোদে আমরা যে তাপ শক্তি পাই তার পরিমান হচ্ছে প্রতি বর্গ মিটারে প্রায় এক কিলোওয়াট। অর্থাত্ এক বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার মেগাওয়াট। যদি এই শক্তির শতকরা মাত্র 10 ভাগ বিদ্যুতে রুপান্তরিত করা যায় তাহলে বাংলাদেশের বর্তমান মোট বিদ্যুত চাহিদা 5000 মেগাওয়াটের জন্য প্রয়োজন হবে মাত্র 50 বর্গ কিলোমিটার এলাকার রোদ। কিন্তু তাতেও একটা সমস্যা থেকে যবে – রোদ পাওয়া যায় কেবল দিনের বেলা – তাহলে রাতে কি হবে? তাই আমার প্রস্তাবনা ছিল রোদের তাপ ব্যাবহার করে কোন ক্যামিক্যাল প্রকৃয়ায় শক্তি সংরক্ষনের ব্যাবস্থা করা। যেমন পানি ভেঙ্গে হাইড্রজেন ও অক্সিজেন তৈরী করে রাখা এবং সেই হাইড্রজেন দিয়ে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুত উৎপদন করা।

এই ধরনের চিন্তা এখনও কল্পনাই রয়ে গেছে। অদুর ভবিষ্যতে হয়তো কোনদিন বাস্তবায়িত হলেও হতে পারে। আমরা সেই অনাগত শুভদিনের প্রতিক্ষায় না থেকে চলুন দেখি এই ভয়াবহ বিপদ থেকে বাঁচার কি ব্যাবস্থা আমরা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছি। বিজ্ঞানিরা যে দুটি উপায়ে এই সমস্যা সমাধানের চেস্টা করছেন তার একটি হচ্ছে নবায়ন যোগ্য শক্তি (Renewable Energy ) এবং অন্যটি হচ্ছে পারমানবিক শক্তি(Nuclear Energy)। আমাদের এই আলোচনা মুলত নিউক্লিয়ার পাওয়ারেই সীমিত থাকবে। তবে অন্যটি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন যাতে নিউক্লিয়ারের উপর আমাদের নির্ভরতা অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

**নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy):** সহজ কথায় এটি এমন এক প্রকার শক্তি, যার উৎস শেষ হয়ে যাবার কোন আশংকা নেই। যেমন সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, জল বিদ্যুত, ভুর্গভস্থ তাপ শক্তি, ঢেউ বা জোয়ার-ভাটার শক্তি ইত্যাদি। এর মধ্যে সোলার প্যানেলে যে সৌর শক্তি ব্যাবহার করা হয় তা রোদের তাপ নয় বরং আলোক শক্তি যা তাপের তুলনায় খুবই কম এবং ব্যাপক ভিত্তিক বিদ্যুত উৎপাদনের উপযোগি নয়। জল বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যাপক আকারে বিদ্যুত উৎপাদন করা গেলেও পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই সুযোগ আছে। আমরা সেই সৌভাগ্যবানদের অন্যতম এবং আমাদের কাপ্তাই জলবিদ্যুত কেন্দ্র থেকে প্রায় 230 মেগাওয়াট বিদ্যুত পেয়ে থাকি যা আর বাড়ানোর কোন সুযোগ নেই। একমাত্র বায়ুশক্তি চালিত উইন্ড টারবাইন কিছুটা সম্ভাবনাময়। কিন্তু তার জন্যও শর্ত হচ্ছে উচ্চ গতির নিয়মিত বায়ু প্রবাহ। এ'ক্ষেত্রে ডেনমার্ক অনুসরনীয় দৃস্টান্ত স্থাপন করেছে। বায়ু থেকে উৎপাদিত বিদ্যুত দিয়ে তারা দেশের চাহিদা মিটিয়ে অন্য দেশে রফতানিও করে থাকে। তা'ছাড়া যুক্ত রাজ্য আগামী 2020 সালের মধ্যে তাদের চাহিদার অন্তত 10 ভাগ বিদ্যুত বায়ুশক্তি থেকে উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করেছে যার পরিমান হবে 12000 মেগাওয়াট। কিন্তু বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের জন্য এটা তেমন কার্যকর নয় কারণ এখানে নিয়মিত উচ্চ গতির বায়ু প্রবাহিত হয় না। যদিও এ'ব্যাপারে আমার নিজনস্ব কিছু বক্তব্য আছে কিন্তু তা এ'খানে প্রাসঙ্গিক নয়। যদি সুযোগ হয় তাহলে অন্য কোন লেখায় তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। মোট কথা নবায়ন যোগ্য শক্তির যেসব উৎস আছে তার কোনটাই বাংলাদেশ বা বিশ্বের আসন্য শক্তি সমস্যা সমাধানের উপযোগী নয় । তাহলে আমাদের পারমানবিক শক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় আপাতত নেই।

**পারমানবিক শক্তি (Nuclear Energy):** পারমানবিক শক্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে একটা ছোট ঘটনা বলে নেই। আমি পারমানবিক শক্তি সম্পর্কে প্রথম জেনেছিলাম সম্ভবত স্কুলে থাকতে। তখন থেকেই আমি এ'টুকু জানি যে অতি অল্প পরিমান ইউরেনিয়াম থেকে প্রচুর বিদ্যুত উৎপাদন করা যায়। কিন্তু তার মাত্রাগত হিসেবের ব্যাপারে আমি এবং আমার সহপাঠী বন্ধুরা দীর্ঘ দিন ভুল ধারনা পোষন করেছি। আমাদের ধারনা ছিল মাত্র কয়েক কেজি ইউরেনিয়াম থেকে বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী ৩-৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুত দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন করা সম্ভ। হতে পারে যেখানে এটা পড়েছিলাম সেখানেই ভুল ছিল অথবা পুরো হিসাবটা মনযোগ দিয়ে পড়িনি। কাজেই সম্মানিত পাঠকদের অনুরোধ করব সময় এবং ধৈর্যের সাথে অন্তত পরিমানগত হিসাবটা সর্ম্পুন পড়ার জন্য।

পারমানবিক শক্তির কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বিজ্ঞানি স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (Albart Einstein) এর সেই বিখ্যাত ইকুয়েশনের কথা। ১৯০৫ সালে জার্মানীর Annals of Physics নামক জার্নালে তার লেখা "Is the inertia of a Body Dependent on its Energy Content?" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যেখানে তিনি তার বিখ্যাত সমীকরন $E=mc^2$ এর অবতারনা করেন যার মুল কথা হচ্ছে বস্তুর ভর এবং শক্তি পরস্পর পরিবর্তনীয়। অর্থাত বস্তুকে শক্তিতে এবং শক্তিকে বস্তুতে পরিনত করা সম্ভব। ব্যাপারটা অনেকটা বরফ এবং পানির সাথে তুলনা করা যায়। বরফ যেমন জমাট বাধা পানির এটা রুপ, এই সমীকরন অনুসারে বস্তুও শক্তির একটা জমাট বাধা রুপ যেখানে অতি সামান্য বস্তুর মধ্যে বিপুল পরিমান শক্তি লুকায়িত থাকে। কিন্তু বরফকে যত সহজে পানি করা যায় বস্তুকে শক্তিতে পরিনত করা তত সহজ নয়।

এই সমীকরনে E হচ্ছে বস্তু ধ্বংস হয়ে উৎপাদিত শক্তি, m হচ্ছে যে বস্তু ধ্বংস হবে তার ভর এবং c হচ্ছে আলোর গতি। যদি ভরকে কেজিতে এবং আলোর গতিকে মি/সেকেন্ডে প্রকাশ করা হয় তাহলে প্রাপ্ত শক্তির একক হবে জুল। সুতরাং এক কেজি ভরের বস্তুকে সর্ম্পুন রুপে শক্তিতে রুপান্তরিত করতে পারলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা হচ্ছে $1Kg \times (3\times10^8 m/s)^2 = 9\times10^{16}$ J । একে বিদ্যুতের বড় একক মেগাওয়াট ডে (এক মেগাওয়াট বিদ্যুত একদিন ধরে ব্যাবহার করলে তাকে এক মেগাওয়াট ডে বলা হয়, যা বিদ্যুতের প্রচলিত ইউনিট কিলোওয়াট আওয়ারের চেয়ে 24000 গুন বড়) তে প্রকাশ করা হলে তা হবে $1.04\times10^6$ MW-Day। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুত চাহিদা ধরা হয় 5000 মেগাওয়াট। সেই হিসেবে এক কেজি বস্তু থেকে প্রাপ্ত শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের 200 দিনেরও বেশি চলা উচিত। আমি আমার স্কুল জীবনের পারমানবিক বিষয়ক পড়াশুনায় সম্ভবত এখানে এসেই থেমে গিয়েছিলাম। তার জন্যই দীর্ঘ দিন আমাকে এই ভুল ধারনা পোষন করতে হয়েছে যে বাংলাদেশের জন্য কয়েক কেজি ইউরেনিয়ামই যথেস্ট। কিন্তু সেটা যে কতবড় ভুল ছিল তা নিচের বাকি হিসাব দেখলেই বোঝা যাবে।

এটা ঠিক যে এক কেজি বস্তুকে শক্তিতে রুপান্তরিত করতে পারলে ঐ পরিমান শক্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু বস্তুকে সর্ম্পুন শক্তিতে পরিনত করার কোন প্রযুক্তি এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। যে দুটি উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রথমটি হচ্ছে ফিশন (Fission) প্রক্রিয়া যেখানে ইউরেনিয়ামের ভারি পরমানু ভেঙ্গে জেনন (Xenon, Xe) এবং স্ট্রনটিয়াম (Strontium, Sr) অথবা বেরিয়াম (Barium, Ba) এবং ক্রিপ্টন (Krypton, Kr) তৈরী করা হয়। উৎপাদিত পরমানু দুইটির মোট ভর ভেঙ্গেফেলা ইউরেনিয়ামের পরমানুটির ভরের চেয়ে সামান্য (0.2080 Atomic mass unit (amu) $= 3.4\times10^{-28}$

Kg) কম। এই ভরই রূপান্তরিত হয়ে তাপ শক্তি হিসেবে নির্গত হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ফিউসন (Fusion)- যেখানে চারটি হাইড্রজেন পরমানু মিলে একটি হিলিয়াম পরমানু তৈরী হয়। এখানেও একই ভাবে উৎপন্ন হিলিয়াম পরমানুর ভর চারটি হাইড্রজেন পরমানুর মোট ভরের চেয়ে সামান্য (.0276 amu $=4.5x10^{-29}$ Kg) কম যা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সূর্যের অভ্যন্তরে এই প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদিত হয়। পৃথীবির বিজ্ঞানীরা এই প্রকৃয়ায় শক্তি উৎপাদন করতে পারলেও তা এখনও পুর্ন নিয়ন্ত্রনে আসেনি, শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত ফিউসনের মাধ্যমে পারমানবিক বোমাই তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এই প্রকৃয়ার শান্তিপুর্ন ব্যাবহার এখনও পরীক্ষাধীন। কাজেই আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র নিউক্লিয়ার ফিসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

**নিউক্লিয়ার ফিসন:** অধিকাংশ বড় আবিষ্কারের মত ফিসন প্রকৃয়াও দুর্ঘটনাবসত বিজ্ঞানীদের দৃস্টিগোচর হয়েছে। ১৯৩৮ সালে দুই জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী অটো হ্যান(Otto Hahn) এবং ফ্রিটজ স্ট্রেসম্যান (Fritz Strassmann) ইউরেনিয়ামের পরমানুর সাথে একটি নিউট্রন যোগ করে আরো ভারী পরমানু তৈরীর চেস্টা করছিলেন। কিন্তু দেখাগেলো ইউরেনিয়ামের কিছু আইসোটোপ ভেঙ্গে গেছে এবং প্রচুর তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে। হ্যান এবং স্ট্রেসম্যানের এই আবিষ্কার প্রকাশিত হওয়ার মাত্র দশ দিনের মাথায় ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৯ লিস মেইটনার(Lise Meitner) এবং অটো রবার্ট ফ্রিন্চ(Otto Robert Frisch) Nature পত্রিকায় এই প্রক্রিয়ার তাত্বিক ব্যখ্যা প্রকাশ করেন। এবং একই বছর ৭ই এপ্রিল ফ্রেডিরিক জুলিয়েট(Frederic Joliet), হ্যান্স ভন হালবান(Hans von Halban) এবং লিউ কওয়ারসকি(Lew Kowarski) 'Liberation of Neutrons in the Nuclear Explosion of Uranium' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যেখানে নিউক্লিয়ার চেইন রিএ্যাকশনের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সেই সময়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ছিলেন আমেরিকায়। তিনি এই আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে ২ আগস্ট ১৯৩৯ সালে তৎকালীন মার্কীন প্রেসিডেন্ট ফ্রেঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের (Franklin D. Roosevelt) কাছে তার বিখ্যাত চিঠিটি লেখেন যেখানে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে জার্মানীর নেতৃত্বাধীন অক্ষ শক্তি নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরীর খুব কাছাকাছি পৌছেগেছে। এবং প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেন যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকাতে নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর উদ্যোগ নেয়ার জন্য। এবং এভাবেই যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার কারণে অতি দ্রুত এই প্রযুক্তি ব্যাবহার করে পারমানবিক বোমা তৈরী করা হয় যার সফল পরীক্ষা চালান হয় জাপানের হিরোশীমায় ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে। পৃথীবির প্রথম সেই অনিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার ফিসনে 50 কেজি ইউরেনিয়াম ব্যাবহার করা হয়েছিল যার মধ্যে ফিসনযোগ্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটোপ ছিল মাত্র এক কেজি এবং সেই প্রক্রিয়ায় মাত্র এক গ্রাম ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই শক্তিই ছিল প্রচলিত বিস্ফোরক টি.এন.টি (Tri-nitro-toluene)এর 20 হাজার টন থেকে উৎপাদিত শক্তির সমান।"

চিত্র: পারমানবিক বিস্ফোরন

এভাবেই সামরিক প্রয়োজনে ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যদিয়েই পৃথিবীর পারমানবিক শক্তির ইতিহাস শুরু হয়েছে। তবে পারমানবিক শক্তির শান্তিপুর্ন ব্যাবহারের ইতিহাসও অর্ধ শতাব্দির অধিক। ১৯৫১ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিস্ঠান Institute of Physics and Power Engineering (IPPE) মস্কোর নিকটর্বতী Obninsk নামক স্থানে প্রথম পারমানবিক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করে যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 5 মেগাওয়াট এবং তাতে নিয়ন্ত্রিত ফিসন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

**চেইন রিএ্যাকশন এবং তার নিয়ন্ত্রন** : ফিসন প্রকৃয়ায় ইউরেনিয়ামের পরমানু ভাঙ্গার জন্য দ্রুত গতির নিউট্রন ব্যাবহার করা হয়। এবং একটি ইউরেনিয়াম পরমানু ভাঙ্গার ফলে নতুন দুই-তিনটি অনুরুপ দ্রুতগতির নিউট্রন তৈরী হয় যা পুনরায় অন্য ইউরেনিয়াম পরমানুকে আঘাত করে। ফলে একটি পরমানু ভাঙ্গার পর তাথেকে উৎপন্ন দুইটি নিউট্রন অন্য দুইটি পরমানু ভেঙ্গে আটটি দ্রুত গতির নিউট্রন তৈরী করতে পারে। এ'ভাবে একবার শুরু করে দেয়ার পর নিজে নিজেই এই প্রকৃয়া চলতে থাকে যাকে চেইন রিএ্যাকশন বলে।

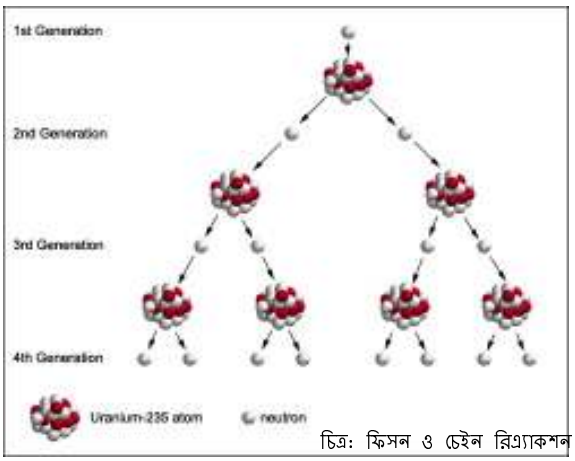

চিত্র: ফিসন ও চেইন রিএ্যাকশন

এভাবে এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে শোল এই হিসেবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক পরমানু ভেঙ্গে যায় এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত চেইন রিএ্যাকশনের মাধ্যমেই পারমানবিক বোমার বিস্ফোরন ঘটান হয়। পারমানবিক শক্তির শান্তিপুর্ন ব্যাবহারের জন্য এই চেইন রিএ্যাকশনকে নিয়ন্ত্রনে রাখা খুবই জরুরী। এ'জন্য নিইক্লিয়ার রিএ্যাক্টরে মডারেটর ব্যাবহার করা হয় যার কাজ অতিরিক্ত নিউট্রন শোষন করে চেইন রিএ্যাকশনকে নিয়ন্ত্রনে রাখা। মডারেটর হিসেবে যাদের ব্যাবহার করা হয় তাদের মধ্যে গ্রাফাইট, ভারী পানি(যেই পানির হাইড্রজেন পরমানুতে একটি অতিরিক্ত নিউট্রন থাকে), স্বাধারণ পানি, গলিত সোডিয়াম এবং সোডিয়াম-পটাশিয়াম অ্যালয় অন্যতম। মডারেটর ব্যাবহারের ক্ষেত্রে তার নিউট্রন ষোশন ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপুর্ন। কারন নিউটোন শোষন ক্ষমতা বেশি হলে উৎপাদিত নিউট্রনের সবগুলোই শোষিত হয়ে যেতে পারে যা চেইন রিএ্যাকশনকে থামিয়ে দেবে, আবার শোষন ক্ষমতা কম হলে অতিরিক্ত নিউট্রন চেইন রিএ্যাকশনকে পারমানবিক বিস্ফোরনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

**নিউক্লিয়ার ফিসনে উৎপাদিত শক্তি:** আগেই বলা হয়েছে একটা ইউরেনিয়াম-235(ইউরেনিয়ামের যে পরমানুর পারমানবিক ভর 235টি প্রটনের ভরের সমান) পরমানু ভেঙ্গার ফলে 0.2080 Atomic mass unit (amu) বা $3.4x10^{-28}$ Kg ভরের বস্তু তাপ শক্তিতে পরিনত হয়। $E=mc^2$ সুত্র অনুসারে এই শক্তির পরিমান প্রায় 193.6 MeV বা $3.1x10^{-11}$ J । তবে এ'ছাড়াও ভেঙ্গে যাওয়া পরমানু থেকে নতুন পরমানু তৈরীর সময় এবং অতিরিক্ত নিউট্রন মডারেটর বা অফিসনযোগ্য বস্তু দ্বারা শোষিত হবার সময় আরো কিছু শক্তি নির্গত হয়। তাই পুর্ন সংখ্যায় ধরা হয় যে একটি ইউরেনিয়াম-235 পরমানু ভেঙ্গে 200 MeV শক্তি নির্গত হয়। এ্যভোগেড্রোর নাম্বার থেকে জানা যায় এক গ্রাম ইউরেনিয়াম-235 আইসোটোপে $6.0225x10^{23}/235$ টি পরমানু থাকে। ফলে এক গ্রাম ইউরেনিয়াম-235 এর সর্ম্পুন ফিসনের মাধ্যমে উৎপাদিত শক্তির পরিমান হয় $5.13x10^{23}$ MeV ~ $8.19x10^{10}$ J ~ 0.948 MW-day বা পুর্ন সংখ্যায় এক মেগাওয়াট-ডে । তাহলে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুত চাহিদা 5000 মেগাওয়াট-ডে তৈরীতে প্রতি দিন লাগবে 5 কেজি ইউরেনিয়াম-235 এর পুর্ন ফিসন।

**নিউক্লিয়ার জ্বালানী:** নিউক্লিয়ার ফিসনে জ্বালানী হিসেবে প্রধানত ইউরেনিয়াম ব্যাবহার করা হয়। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপ (একই পদার্থের ভিন্ন ভর বিশিস্ট পরমানুকে ঐ পদার্থের আইসোটোপ বলে) পাওয়া যায়। যেমন- ইউরেনিয়াম-233, ইউরেনিয়াম-235 এবং ইউরেনিয়াম-238। এর মধ্যে ইউরেনিয়াম-235 এবং ইউরেনিয়াম-233 কে ফিসন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে প্রাকৃতিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তা থাকে ইউরেনিয়েম অক্সাইড হিসেবে এবং তাতে ফিসনযোগ্য আইসোটোদুটির পরিমান মাত্র 0.7%। সমৃদ্ধ করনের(Enreachment)মাধ্যমে এই হার 10-15% পর্যন্ত বাড়ান যায়। তবে সমৃদ্ধকরণ প্রকৃয়া খুবই ব্যায়বহুল। স্বভাবতই যত বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যাবহার করা হবে তার দামও তত বেশি হবে। আমরা যদি 7% ফিসনযোগ্য ইউরেনিয়াম-235 সমৃদ্ধ জ্বালানী ব্যাবহার করি তাহলে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় দৈনিক 5 কেজি ফিসনযোগ্য ইউরেনিয়াম পেতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম লাগবে 71 কেজি এবং বছরে প্রায় 26 টন! হিসাব কিন্তু এখানেই শেষ নয় আরো আছে। সেই হিসেবের শুরুতে আধুনিক রিএ্যাক্টরে নিউক্লিয়ার জ্বালানী হিসেবে ব্যাবহারকৃত অন্য দুটি পদার্থের কথা বলা যাক।

নিউক্লিয়ার জ্বালানী হিসেবে আরো দুটি পদার্থ ব্যাবহার করা হয় -থোরিয়াম (Thorium, $Th^{232}$) এবং প্লুটোনিয়াম (Plutonium, $Pu^{239}$) যারা সেকেন্ডারী জ্বালানী হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে থোরিয়ামকে বলা হয় উর্বর উপাদান(Fertile Element) কারণ থোরিয়াম নিজে ফিসনে অংশ নিতে পারে না, কিন্তু থোরিয়াম থেকে ফিসনযোগ্য ইউরেনিয়াম-235 তৈরী করা যায়। এ'রকম আরএকটি উর্বর উপাদান হচ্ছে ইউরেনিয়াম-238, যাথেকে প্লুটোনিয়াম-239 তৈরী হয় এবং এই প্লুটোনিয়াম ফিসননের মাধ্যমে শক্তি তৈরীতে ব্যাবহার কারা হয়। আধুনিক নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরে ইউরেনিয়াম এর তিনটি আইসোটোপের সাথে থোরিয়াম মিলিয়ে এমন ভাবে ব্যাবহার করা হয় যাতে একটি ইউরেনিয়াম-235 ভেঙ্গে যে দুটি অতিরিক্ত নিউট্রন তৈরী হয় তাদিয়ে থোরিয়াম-232 থেকে ইউরেনিয়াম-233 এবং ইউরেনিয়াম-238 থেকে প্লুটোনিয়াম-239 তৈরী করা যায়। ফলে আলাদা কোন মডারেটর ব্যাবহার না করেও একই সাথে চেইন রিএ্যাকশনের নিয়ন্ত্রন করা হয় আবার ফিসনযোগ্য নতুন জ্বালানীও পাওয়া যায়। এ'ধরনের রিএ্যাক্টরকে ফাস্ট-ব্রিড রিএ্যাক্টর বলে এবং এই রিএ্যাক্টরে 10-20 বছরের মধ্যে প্রাথমিক ফিসনযোগ্য জ্বালানীর সমপরিমান নতুন জ্বালানী তৈরী হয়। এই সময়কে ডাবলিং টাইম বলে এবং স্বভাবতই যে রিএ্যাক্টরের ডাবলিং টাইম যত কম তাতে প্রাথমিক জ্বালানীও তত কম লাগে। কাজেই আমরা যদি এই ধরনের রিএ্যাক্টর ব্যাবহার করি এবং তার ডাবলিং টাইম যদি হয় 25 বছর তাহলে সে তার 50 বছরের জীবনকালে মোট যে জ্বালানী ব্যাবহার করবে তা হবে প্রাথমিক জ্বালানীর প্রায় 4 গুন। ফলে গড়ে প্রতি বছর প্রাথমিক জ্বালানী খরচ হবে 6.4 টনের মত।

**বিদ্যুত উৎপাদন:** এখন পর্জন্ত আমরা যে হিসেব করেছি তাতে নিউক্লিয়ার ফিসনের ফলে উৎপাদিত শক্তির সাথে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন বিদ্যুত শক্তির সরাসরি তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু ফিসনের ফলে যে শক্তি উৎপন্য হয় তা পাওয়া যায় তাপ শক্তি হিসেবে। আর এই তাপ শক্তি থেকে বিদ্যুত উৎপাদনের কোন সরাসরি পদ্ধতি আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। আমাদের যেটা করতে হয় তাহচ্ছে- তাপ শক্তির সাহায্যে পানি ফুটিয়ে

বাস্প বানিয়ে সেই বাস্পের সাহায্যে স্টিম টারবাইন ঘুরান। সেই টারবাইনের সাথে সংযুক্ত থাকে ইলেক্ট্রিক জেনারেটর যাথেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুত পাওয়া যায়। চিত্রে এ'ধরনের একটি আয়োজন দেখান হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে Reactor Core এ Fuel Rod সেট করা আছে। মুল ফিসন প্রকৃয়া এখানেই সংগঠিত হয় এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। Pump এর সাহায্যে এই Reactor Core এ পানি প্রবেশ করান হয় যা ফুয়েল রডে উৎপন্ন তাপ শোষন করে। এটি একটি Pressurised Water Reactor এর চিত্র যেখানে পানিকে অতি উচ্চ চাপে (প্রায় 1200 psi) রাখা হয়। ফলে পানি বাস্প না হয়েও প্রচুর তাপ ধারন করতে পারে। অনেক রিএ্যাক্টরে এই তাপ পরিবহনের জন্য স্বাধারন পানির পরিবর্তে ভারি পানি, গলিত সোডিয়াম, সোডিয়াম-পটাশিয়াম অ্যালয় ইত্যাদিও ব্যাবহার করা হয যা বাড়তি কিছু সুবিধা দিয়ে থাকে। পরর্বতীতে Heat Exchanger এ এই তাপ শক্তি বাইরের দ্বীতিয় সার্কিটের পানিকে বাস্পে পরিনত করতে ব্যাবহার করা হয়, যে বাস্প টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার দক্ষতা (Efficency) 40% এর বেশি স্বাধারনত হয় না। অর্থাত্ যে তাপশক্তি রিএ্যাক্টর কোরে ফিসনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় তার শতকরা চল্লিশ ভাগেরও কম বিদ্যুত শক্তিতে রুপান্তর করা যায়। কাজেই আমাদের এক বছরে প্রাথমিক জ্বালানী খরচ হবে মোটামুটি 15 টনেরমত ।

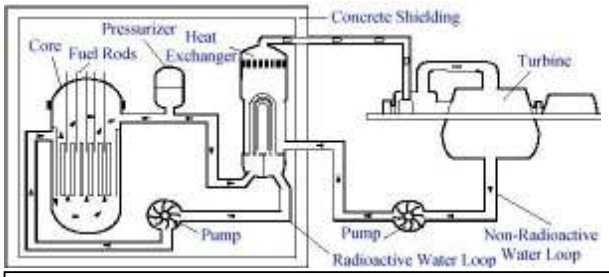

চিত্র: প্রেসারাইজড ওয়াটার নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের ফাংশনাল ডায়াগ্রাম

কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই একবারে 5000 মেগাওয়াটের পুরোটাই নিউক্লিয়ার থেকে উৎপাদনের কথা ভাবছি না। প্রাথমিক ভাবে 700-1000 মেগাওয়াটের একটা ইউনিট দিয়ে শুরু করাই যুক্তি সংগত। এটা শুধু এ'জন্য নয় যে আমরা 5000 মেগাওয়াটের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী বা স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারব না বরং আরো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যা পরর্বতী অংশে আলোচনা করা হল। এই 700-1000 মেগাওয়াটের প্রথম ইউনিটে 25-30 টন পারমানবিক জ্বালানী সেট করে দিলে তা কমবেশি 40 বছরের জন্য যথেস্ট হবে। যদিও এই হিসাবটা একেবারেই তাত্বিক এবং স্থুল(Gross), ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সুক্ষ্ম ভাবে হিসেব করলে তা নিশ্চই এর থেকে ভিন্ন হবে, তবুও এটা নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে মাত্র কয়েক কেজি ইউরেনিয়াম দিয়ে দেশের মোট বিদ্যুত চাহিদার সমান বিদ্যুত উৎপাদনের চিন্তা কতাটা ভুল ছিল। তবে ওজনে বেশি হলেও আকারের দিক দিয়ে কিন্তু তা খুব অল্পই থাকছে। কারণ ইউরেনিয়াম খুবই ভাড়ি পদার্থ যার প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের ওজন 18.6 গ্রাম। ফলে 25 টন ইউরেনিয়ামের আয়াতন হবে মাত্র 47.5 সি.এফ.টি। চার ফিট লম্বা, চার ফিট চওড়া আর তিন ফিট উচু একটা বাক্সে তা অনায়াসে রেখে দেয়া যাবে।

**পাওয়া সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা:** বিদ্যুত শক্তির একটা বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে উৎপাদনের সাথেসাথেই ব্যাবহার করে ফেলতে হয় – সংরক্ষন করে রেখে পরে ব্যাবহারের কোন উপায় নেই। উল্টোভাবে বললে- বিদ্যুতের উৎপাদন সবসময় চাহিদা অনুযায়ী হতে হয়। যদি চাহিদার চেয়ে কম উৎপাদন হয় তাহলে যা ঘটে তা আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি – লোড শেডিং এর মাধ্যমে চাহিদা কমিয়ে রাখা হয়। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদিত হওয়া তার চেয়েও বিপদজনক, কারন অতিরিক্ত বিদ্যুত শক্তি ওভার ফ্রিকোয়েন্সি এবং ওভার ভোল্টেজের মত সমস্যা তৈরী করবে যা অধিকাংশ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ'জন্য সকল পাওয়ার প্ল্যান্টেই ইলেক্ট্রিক্যাল অংশের কন্ট্রোলের জন্য Automatic Voltage Regulator (AVR) এবং মেকানিক্যাল অংশের কন্ট্রোলের জন্য গর্ভনর ব্যাবহার করে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের উৎপাদন ঠিক রাখার ব্যাবস্থা করা হয়। প্রচলিত গ্যাস বা তেল ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্টে জ্বালানী সরবরাহ নিয়ন্ত্রন করেই উৎপাদন নিয়ন্ত্রন করা হয়। কিন্তু নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে জ্বালানী সরবরাহ নিয়ন্ত্রন করার সহজ কোন উপায় থাকে না এবং এই নিয়ন্ত্রন আর্থিক ভাবেও লাভজনক নয়। তাই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট শুধুমাত্র বেজ লোড বা এমন পরিমান বিদ্যুত উৎপাদনে ব্যাবহার করা হয়, পুরো বিদ্যুত সিস্টেমের চাহিদা যার নিচে কখনই নামে না।

**বেজ লোড বা নিম্নতম চাহিদা:** বিদ্যুতের চাহিদা সব সময় পরিবর্তনশীল। সন্ধ্যার সময় এই চাহিদা সর্বোচ্চে পৌছে যাকে আমরা পিক আওয়ার বলি। আবার রাতের তৃতীয় প্রহরে তা সর্ব নিম্নে পৌছে যাকে অফপিক আওয়ার বলি। আবার শীত কালের চাহিদা গ্রিস্মকালের তুলনায় অনেক কম থাকে। এভাবে বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনশীল চাহিদার মধ্যেও একটা নিম্নতম বেজ থাকে, বিদ্যুতের চাহিদা কখনই যার নিচে নামে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বেজ লোড শীতকালের মধ্যরাতের চাহিদার কাছাকাছি হবে। বিদ্যুতের চাহিদা যখন এই বেজ লোডের কাছাকাছি পৌছে যায় তখন বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপাদন কমিয়ে চাহিদা ও উৎপাদনের সম্পর্ক ঠিক রাখা হয়। বাংলাদেশের বিদ্যুত ব্যাবস্থায় পিক লোড এবং বেজ লোডের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী। গ্রীস্মের পিক আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা যেখানে সাড়ে পাচ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যায় সেখানে শীতের রাতে নেমে আসে দুই হাজার মেগাওয়াটের নিচে। আমাদের বর্তমান উৎপাদন ব্যাবস্থার অধিকাংশই গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র যা কখনই সম্পুর্ন বন্ধ করা যায় না। কারণ

এ'গুলো একবার বন্ধ হলে পুনোরায় চালু করতে 7-8 ঘন্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত সময় লেগে যায়। তবে জ্বালানী সরবরায় কমিয়ে এদের উৎপাদন 40% পর্যন্ত নামিয়ে আনা যায়। আমাদের বর্তমানে চালু তাপবিদ্যুতকেন্দ্রগুলোর মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় আড়াই হাজার মেগাওয়াট। বেজ লোডের সময় তাদের উৎপাদন 1000 মেগাওয়াট পর্যন্ত নামিয়ে আনা যাবে বলে আশা করা যায়। এর সাথে আছে কাপ্তাই জল বিদ্যুত কেন্দ্র, যেখান থেকে সবচেয়ে কম খরচে 200 মেগাওয়াট বিদ্যুত পাওয়া যায় এবং যা বন্ধ করে দেয়া অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক নয়। তাহলে শুধুমাত্র সিস্টেম চালু রাখান জন্য কম পক্ষে 1200 মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অফ বাংলাদেশে কর্মরত আমার সহপাঠী বন্ধূ ইঞ্জিনিয়ার রিফাত বিন সায়ীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গত শীত মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন লোড (বেজ লোড) ছিল মাত্র 1400 মেগাওয়াট। তাহলে এই মুহূর্তে আমাদের জন্য 700 মেগাওয়াটের চেয় বড় পারমানবিক প্ল্যান্ট স্থাপন করা নিরাপদ এবং লাভজনক হবে না। তবে মনে রাখা দরকার, একটা পারমানবিক কেন্দ্র স্থাপন করে তাথেকে বিদ্যুত পেতে কম পক্ষে পাঁচ বছর সময় লাগে। কাজেই আমাদের পাঁচবছর পরে বিদ্যুত ব্যাবস্থা কীরকম হবে সেটা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একই সাথে বিদ্যুত ব্যাবস্থার উন্নতির জন্য বেজ লোড বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে বর্তমানে বড় এবং মাঝারি মিলিয়ে কয়েক হাজার ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা চালু থাকে এবং নিজেরাই প্রয়োজনীয় বিদ্যুত উৎপাদন করে। যারা গ্যাস জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুত উৎপাদন করে তাদের ইউনিট প্রতি খরচ 2 টাকার নিচে থাকলেও ডিজেল জেনারেটরে এই খরচ আট টাকার উপরে উঠে যায়। কাজেই এদেরকে যদি রাত এগারটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত কম দামে বিদ্যুত সরবরাহ করা যায় তাহলে বেজ লোড অনেকটাই উন্নত করা যাবে। তবে বিদ্যুতের দামের চেয়েও এদের কাছে যে বিষয়টা বেশি গুরুত্বর্পুন হবে তা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন এবং সঠিক ভোল্টেজের বিদ্যুত পাওয়ার নিশ্চয়তা। করণ এই ক্ষেত্রে কোনরুপ শিথিলতা তাদের বহু মুল্যবান যন্ত্রপাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গড়ে 500 কিলোওয়াট বিদ্যুত ব্যাবহার করে এমন দুই হাজার ইন্ডাস্ট্রিকে বিদ্যুত ব্যাবস্থার সাথে সংযুক্ত করতে পারলে বেজ লোড 1000 মেগাওয়াট পর্যন্ত উন্নীত করা যাবে। তখন আমরা আরো বড় নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের কথা ভাবতে পারব।

**স্থান নিরবাচন:** যেকোন পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের স্থান নিরবাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বর্পুন দুটি বিষয় হচ্ছে – জ্বালানির সহজলভ্যতা এবং লোড সেন্টার বা উৎপাদিত বিদ্যুত ব্যাবহারের স্থান। তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য এর সাথে আরএকটি গুরুত্বর্পুন বিষয় হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি। পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র মুলত তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রের অনুরুপ যেখানে তাপের উৎস হিসেবে কয়লা বা গ্যাসের পরিবর্তে পারমানবিক ফিসন ব্যাবহার করা হয়। তাই জ্বালানী সহজলভ্যতা এখানে তেমন গুরুত্বর্পুন নয় তবে বাকি দুটি – লোড সেন্টার এবং পানির সাথে নতুন যে বিষয়টি যোগ হবে তা হচ্ছে জনবহুল এলাকা না হওয়া। মুলত দুর্ঘনটা এবং পারমানবিক বিকিরন থেকে বাঁচার জন্যই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। এ'সবদিক চিন্তা করলে ইশ্বরদীর রুপপুরে যে স্থান 46 বছর আগে বির্ধারন করে রাখা হয়েছে তা সব দিকদিয়েই উপযুক্ত বলা যায়। এটি পদ্মা নদীর কাছে যা প্রয়োজনীয় পানির নিশ্চয়তা বিধান করে এবং এলাকাটি খুব বেশি জনবহুলও নয়। আমাদের উত্তর বঙ্গে সদ্য প্রতিস্ঠিত কয়লা ভিত্তিক একমাত্র প্ল্যান্টটি ছাড়া আর কোন বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র নেই। ফলে ঘোরাশালে উৎপাদিত বিদ্যুত দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে টেনে নিতে হয় যা প্রচুর বিদ্যুত নস্ট করে। কাজেই উত্তর বঙ্গের চাহিদা বিবেচনা করে এখানে প্রয়োজনীয় মানের একটি পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন করা লাভজনক হবে বলে আশা করা যায়।

তবে সেই সাথে দেশের অন্যন্য অঞ্চল যেমন দক্ষিনের খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং উত্তর পশ্চিমের সিলেট বিভাগের জন্যও এখন থেকে স্থান নিরবাচনসহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা তৈরীর কাজ শুরু করা যেতে পারে। কারণ এ'সব এলাকায় বিদ্যুতের ব্যাপক ঘাটতি আছে, সিলেটে গ্যাস থাকলেও খুলনা এবং বরিশালে বিদ্যুত উৎপাদনে ব্যাবহারযোগ্য কোন জ্বালানী নেই এবং একজায়গায় অনেক বড় প্ল্যান্ট স্থাপনের চেয়ে তুলনামুলক ভাবে ছোট কয়েকটি প্ল্যান্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা সুবিধাজনক। এতে একদিকে ট্রান্সমিশন লস যেমন কম হবে তেমনি কোন দুর্ঘনা ঘটলেও তা একটি মাত্র প্ল্যান্টকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, বাকিগুলো থেকে বিদ্যুত উৎপাদন অব্যাহত রাখা যাবে। তবে খুব ছোট ইউনিট করাও আবার লাভজনক নয়। তাই প্রত্যেক এলাকার স্থানীয় লোড বিবেচনা করে সম্ভাব্য সবচেয়ে লাভজনক মানের ইউনিট স্থাপন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে ইউনিট সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ রাখতে হবে।

**পারমানবিক বর্জ ব্যাবস্থাপনা:** পারমানবিক ফিসনের ফলে ইউরেনিয়ামের বড় এবং ভারি পরমানু ভেঙ্গে তুলনামুলকভাবে হালকা এবং ছোট পরামানুর পর্দার্থ তৈরী হয়। সেই সাথে নিউট্রন, প্রট্রন, নিউট্রিনো এবং ইলেক্ট্রনেরমত অতি সুক্ষ্ম কনিকা নির্গত হয় যা এই প্রক্রিয়ায় ব্যাবহারকৃত অধিকাংশ পর্দার্থকেই তেজস্ক্রীয় পদার্থে পরিনত করে। যেমন নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টরে মডারেটর হিসেবে ব্যাবহার করা স্বাধারন বা ভারী পানি, গ্রাফাইট রড, তাপ পরিবহনের জন্য ব্যাহার করা গলিত সোডিয়াম ইত্যাদিসহ রিএ্যাক্টর কোর তৈরীতে ব্যাবহার করা প্রায় সব পর্দার্থই ব্যাবহার শেষে

পারমানবিক বর্জ হিসেবে বিশেষ ব্যাবস্থায় সংরক্ষন করতে হয়। এই বর্জ থেকে বির্গত তেজস্ক্রীয়তা অত্যন্ত সুক্ষ্ম পর্যায়ে পরিবর্তন স্বাধন করতে পারে। যেমন প্রানী কোষের আভ্যন্তরীন বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তন করা যা ক্যান্সারেরমত মারাত্মক রোগের সুচনা করে বা প্রানীর শারীরিক গঠন নিয়ন্ত্রনকারী জেনেটিক কোড পরিবর্তন করে দিয়ে বিকৃত চেহারার প্রানীর জন্মদেয়া। চেরেনোবিলে সংগঠিত পারমানবিক বিস্ফোরনের প্রভাবে এখনও সেখানে দুই মাথা গরু বা চার পেয়ে মুরগী জন্মনিতে দেখা যায় যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই ছাপা হয়।

এই তেজস্ক্রীয়তার একটা মারাত্মক দিক হচ্ছে একে কোথাও বন্দী করে রাখা যায়না। কয়েক ফিট চওড়া কনক্রিটের দেয়াল ভেদ করে যাওয়া এর জন্য কোন ব্যাপারই না। তবে এ'ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা চিন্তা আছে যা নিয়ে এখনও কোন গবেষনা হয়েছে কি না আমি জানি না। বিষয়টা হচ্ছে মহাকাশে সুর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র থেকে প্রচুর তেজস্ক্রিয়তার বিকিরন হয়। সেই তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচানোর জন্য সৃস্টিকর্তা প্রথিবীর চারদিকে ওজনের একটা স্তর তৈরী করে দিয়েছেন। মহাকাশের অতিমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা থেকে যে ওজনস্তর আমাদের রক্ষা করছে তা কি পৃথীবিতে উৎপন্য সামান্য পারমানবিক বর্জের তেজস্ক্রিয়তা থেকে আমাদের বাচাতে পারবে না? চারপাশে ওজনের আস্তরনসহ বড় একটা বাংকার বানিয়ে তার মধ্যে এইসব তেজস্ক্রীয় বর্জ রেখে দেয়া যেতে পারে। তবে এ'ব্যাপারে কোন গবেষনার খবর যেহেতু আমার চোখে পড়েনি তাই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

তেজস্ক্রিয় বর্জের জন্য স্বাধারনত যা করা হয় তাহচ্ছে কোন জনবিরল এলাকায় মাটির নিচে পুতে রাখা। কিন্তু তাতে ভুর্গভস্ত পানি দুষিত হবার আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশে জনবিরল এলাকা পাওয়া যেমন কঠিন তেমনি শেচ ও খাবার পানির জন্য আমরা বেশি মাত্রায় ভুর্গভস্ত পানির উপর নির্ভরশীল। তাই সমতলের কোন জায়গায় এ'ভাবে তেজস্ক্রীয় বর্জ রাখা নিরাপদ হবে না। যদি পারবত্য চট্টগ্রামের কোন পাহাড় পাওয়া যায় যার চারদিকে ৫-৬ কিলোমিটারের মধ্যে কোন লোকবসতি নেই, তাহলে সেই পাহাড়ের উপরে বাংকার বানিয়ে এই বর্জ রাখার ব্যাবস্থা করা যেতে পারে।

**পারমানবিক শক্তির ভয়াবহতা:** পৃথিবির স্বাধারন মানুশের পারমানবিক শক্তির সাথে প্রথম পরিচয়ই হয়েছে এক ভয়বহ এবং নৃশংস ধ্বংস যজ্ঞের মধ্য দিয়ে যা সংগঠিত হয়েছিল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। তবে সেটাই শেষ নয়। এর পর বিদ্যুত উৎপাদনের কাজে ব্যাবহার করতে গিয়ে বড় আকারের দুর্ঘনা ঘটেছে অন্তত তিনটি। প্রথমটি ১৯৫৭ সালে বৃটেনের উইন্ডস্কেলে, দ্বিতীয়টি ১৯৭৯ সালে আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডে আর তৃতীয় কিন্তু ক্ষয় ক্ষতির দিক দিয়ে প্রথমটি ঘটে সোভিয়েট ইউনিয়নে (বর্তমান ইউক্রেন) ১৯৮৬ সালের যার তেজস্ক্রীয়তার প্রভাব দুই দশকেও শেষ হয়নি। এখনও সেখানে বিকৃত আকারের প্রানি জন্ম নিতে দেখা যায়। আর থ্রি মাইল আইল্যান্ডের যে ইউনিটটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটি পরিত্যাক্ত হলেও অন্য ইউনিটটি পুর্নগঠনের পর ১৯৮৫ সালে পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে এবং এখও চালু আছে। তবে এ'গুলোকে এখন অতিত ইতিহাস হিসেবেই দেখা যেতে পারে। গত দুই দশকে নিউক্লিয়ার টেকনোলজীর ব্যাপক উন্নতি হয়ছে এবং বর্তমানে সারা বিশ্বে একে নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহন করা হচ্ছে।

**বিশ্ব ব্যাপি পারমানবিক শক্তির ব্যাবহার:** পরমানবিক শক্তিই যে আগামী দিনের শক্তির প্রধান উৎস হয়ে উঠবে তা বোঝা যায় গত কয়েক দশকে এর ব্যাবহারের অগ্রগতি দেখে। International Atomic Energy Agency (IAEA) এর হিসাব মতে, বর্তমানে সারা বিশ্বে মোট 441 টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু আছে যার মাধ্যমে 358 গিগাওয়াট (এক গিগিওয়াট সমান এক হাজার মেগাওয়াট) বিদ্যুত উৎপাদিত হয়। আরো 32টি ইউনিট নির্মানাধীন আছে। আশা করি বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনের কাজ অচিরেই শুরু হবে এবং এই সংখ্যা তখন হবে 33!!

চিত্র: যুক্তরাস্ট্রের থ্রি মাইল আইল্যান্ড নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে প্রচলিত জ্বালানী প্রাপ্তির দিক দিয়ে ফ্রান্সের অবস্থা সবচেয়ে করুন। তেল-গ্যাস জাতীয় জ্বালানীর প্রায় পুরোটাই তাকে আমদানী করতে হয়। এই অবস্থা ফ্রান্সকে পারমানবিক জ্বালানীর মাধ্যমে বিদ্যুত উৎপাদনে ব্যাপক ভাবে অনুপ্রানিত করেছে। ফলে বর্তমানে 59 টি পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্র থেকে তারা যে বিদ্যুত উৎপাদন করছে তা তাদের মোট চাহিদার 78.1%। অবশ্ব এ'দিক দিয়ে প্রথম স্থানে আছে লিথিউনিয়া যার উৎপাদন মোট চাহিদার 80%। তবে তাদের পারমানবিক কেন্দ্রগুলো মুলত সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়ন যুগে ইউনিয়নভুক্ত সবগুলো রাস্ট্রে বিদ্যুত সরবরাহের জন্য প্রতিস্ঠিত হয়েছিল। ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর এ'গুলো লিথিউনিয়ার একক নিয়ন্ত্রনে চলে এসেছে। আর সংখ্যার দিক দিয়ে 104 টি পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র নিয়ে যুক্তরাস্ট্র অনেক এগিয়ে আছে যদিও এই উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুত তাদের মোট চিহিদার মাত্র 20% পুরোন করে। এর পরে আছে ফ্রান্স

59 টি এবং জাপান 54 টি। আমাদের প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ইনডিয়ায় 14 টি এবং পাকিস্তানে আছে দুই টি পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র। এই পরি সংখ্যান থেকে সহযেই অনুমান করা যায় পারমানবিক উৎস থেকে বিদ্যুত উৎপাদন কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

**স্থাপন খরচ:** পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্রের সুবিধা অনেক অনেক যেমন ইউনিট প্রতি উৎপাদন খরচ কম, জ্বালানী সংরক্ষন বা পরিবহনের কোন ঝামেলা নেই, একবার চালু হলে 40-50 বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে, প্রচলিত জ্বালানীরমত কার্বন-ডাইঅক্সাইড তৈরী করে পরিবেশ দুষন করে না ইত্যাদি। কিন্তু এর প্রধানতম অসুবিধা হচ্ছে প্রাথমিক খরচ। একটা পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্রের পুরো জীবনকালে মোট যা খরচ হয় তার প্রায় ৪০ ভাগেরও বেশী লাগে উৎপাদন শুরুর আগেই। এব্যাপারে American Nuclear Society থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমেরিকাতে পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনে গড়ে প্রতি কিলোওয়াট ক্ষমতারা জন্য খরচ পরে প্রায় 1500 ডলার। এই হিসাবের মধ্যে নিউক্লিয়ার জ্বালানীর দাম, জমির দাম, বিল্ডিং এবং অন্যান্য স্থাপনার নির্মান খরচ, শ্রমিকের মজুরী, এবং সরকারী ট্যাক্সও অর্ন্তভুক্ত। বাংলাদেশে শুধুমাত্র নিউক্লিয়ার জ্বালানী ছাড়া অন্য সবগুলোর খরচ আমেরিকার তুলনায় অনেক কম হবে। প্রতি ইউনিট ক্ষমতার জন্য 1200 ডলার বা ৪4000 টাকা ধরা হলে 900 মেগাওয়াটের একটা ইউনিট স্থাপনে সম্ভাব্য খরচ পড়বে 118 কোটি ডলার বা প্রায় সারে সাত হাজার কোটি টাকা। এই প্ল্যান্ট থেকে অন্তত 40 বছর ধরে বিরবিচ্ছিন্নভাবে 900 মেগাওয়াট বিদ্যুত পাওয়া যাবে যার মোট পরিমান হবে একত্রিশ হাজার কোটি ইউনিটেরও বেশী। প্রতি বছরই উৎপাদন হবে সারে সাতশ কোটি ইউনিট, 2 টাকা প্রতি ইউনিট হিসেবে 1500 কোটি টাকা যা মোট বিনিয়োগের 20%। চল্লিশ বছর মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য বছরে 20% রিটার্ন নি:সন্দেহে লাভজনক।

Nuclear Power Reactors In Operation And Under Construction
Published by International Atomic Energy Agency

| Country | Reactors in Operation | | Reactors under Construction | | Nuclear Electricity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No of Units | Total MW | No of Units | Total MW | TW(e).h | % of total demand |
| Argentina | 2 | 935 | 1 | 692 | 5.39 | 7.23 |
| Armenia | 1 | 376 | | | 2.09 | 40.54 |
| Belgium | 7 | 5760 | | | 44.74 | 57.32 |
| Brazil | 2 | 1901 | | | 13.84 | 3.99 |
| Bulgaria | 4 | 2722 | | | 20.22 | 47.30 |
| Canada | 14 | 10018 | | | 70.96 | 12.32 |
| China | 7 | 5318 | 4 | 3275 | 23.45 | 1.43 |
| Czech R. | 6 | 3468 | | | 18.74 | 24.54 |
| DPR Korea | | | 1 | 1040 | | |
| Finland | 4 | 2656 | | | 21.44 | 29.81 |
| France | 59 | 63073 | | | 415.50 | 77.97 |
| Germany | 19 | 21283 | | | 162.25 | 29.85 |
| Hungary | 4 | 1755 | | | 12.79 | 36.14 |
| India | 14 | 2503 | 7 | 3420 | 17.76 | 3.68 |
| Iran | | | 2 | 111 | | |
| Japan | 54 | 44287 | 3 | 3696 | 313.81 | 34.47 |
| Korea RP | 18 | 14890 | 2 | 1920 | 113.07 | 38.62 |
| Lithuania | 2 | 2370 | | | 12.9 | 80.12 |
| Mexico | 2 | 1360 | | | 9.35 | 4.07 |
| Netherlands | 1 | 450 | | | 3.69 | 4.00 |
| Pakistan | 2 | 425 | | | 1.80 | 2.54 |
| Romania | 1 | 655 | 1 | 655 | 5.11 | 10.33 |
| Russia | 30 | 20793 | 3 | 2825 | 129.98 | 15.98 |
| S. Africa | 2 | 1800 | | | 11.99 | 5.87 |
| Slovakia | 6 | 2408 | 2 | 776 | 17.95 | 54.73 |
| Slovenia | 1 | 676 | | | 5.31 | 40.74 |
| Spain | 9 | 7574 | | | 60.28 | 25.76 |
| Sweden | 11 | 9432 | | | 65.57 | 45.75 |
| Switzerland | 5 | 3200 | | | 25.69 | 39.52 |
| Taiwan | 6 | 4884 | 2 | 2700 | 33.94 | 20.53 |
| UK | 31 | 12252 | | | 25.69 | 39.52 |
| Ukraine | 13 | 11207 | 4 | 3800 | 73.38 | 45.66 |
| USA | 104 | 98230 | | | 780.10 | 20.34 |
| Total 34 Countries | 441 | 358661 | 32 | 26910 | 2574.17 | |

আর এই বিদ্যুত দিয়ে যেসব কল-কারখানা ও ব্যাবসা প্রতিস্ঠান চলবে তাদের লাভ বিবেচনায় আনলে সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের চেহারাই বদলে যাওয়ার আশা করা যায়। বর্তমানে শুধুমাত্র বিদ্যুত সমস্যার কারনে দেশি-বিদেশি বহু সংখ্যক বিনিয়োগকারী ইন্ডাস্ট্রি প্রতিস্ঠা বা ব্যাবসা শুরুর আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বাংলাদেশ সরকার সদ্যপ্রাপ্ত এই শুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপারে আন্তরিক হলে আশা করা যায় এ'রকম লাভজনক একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য টাকার অভাব হবে না। আর এরকম চার-পাঁচটা ইউনিট স্থাপিত হলেই আমরা দুর্বিসহ বিদ্যুত সমস্যা থেকে মুক্তি পাব।


তথ্যসুত্র: 1. Powerplant Technology – M.M. El-Walil, Professor of Mechanical and Nuclear Engineering, University of Wisconsin

2. Web site of International Atomic Energy Agency

3. Web site of Bangladesh Power Development Board

4. Web site of Americal Nuclear Soceity

5. Many other web sites